Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৯ ডিসেম্বর, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ৮ ডিসেম্বর , ২০১৪ ২১ অগ্রহায়ণ , ১৪২১

সংগ্রামী কমিউনিস্ট নেতা সমর বাওরার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ ডিসেম্বর : প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা, রাজ্য কৃষক সভার প্রাক্তন সম্পাদক এবং জেলার কৃষক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা সমর বাওরার জীবনাবসান হয় ২ ডিসেম্বর। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর নিজ বাড়ি মঙ্গলকোট থানার নারায়ণপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র এবং এক কন্যা।

মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসেন সি পি আই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য নিরুপম সেন, সর্বভারতীয় কৃষক নেতা মদন ঘোষ, নৃপেন চৌধুরী, অমিয় পাত্র, বিপ্লব মজুমদার, তরুণ রায়, অমল হালদার প্রমুখ। সি পি আই(এম)-এর জেলা দপ্তরে মরদেহ আসার পর শেষ শ্রদ্ধা জানান অগণিত মানুষ। মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান নিরুপম সেন, মদন ঘোষ, নৃপেন চৌধুরী, মিতালি কুমার এবং জেলা পার্টির নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও কৃষকসভার উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সম্পাদক ও তাঁদের প্রতিনিধিরা মরদেহে মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

বর্ধমান

বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র, কৃষকসভার সর্বভারতীয় সম্পাদক হান্নান মোল্লা গভীর শোক প্রকাশ করে বার্তা পাঠিয়েছেন।

মরদেহ নিয়ে যখন ব্যাপক মানুষের মিছিল সিউড়ি রোডের দিকে যাত্রা করে, তখন রাস্তার দু'পাশে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। মরদেহ যখন গুসকরা জোনাল অফিসে পৌঁছায় তখন অগণিত মানুষ সেখানে মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। মরদেহে মালা দেন কৃষকনেতা অচিন্ত্য মজুমদার, সৈয়দ মহম্মদ মসীহ, সুরেন হেমব্রম সহ জোনাল নেতৃত্ব। এরপর মরদেহ কাশেমনগরে পৌঁছালে গরিব মহিলারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সমগ্র এলাকা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। মরদেহের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন মদন ঘোষ, নৃপেন চৌধুরী, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক সহ জেলার কৃষক নেতৃত্ব। এরপর নারায়ণপুর গ্রামে শেষকৃত্য হয়। চোখের জলে শেষ বিদায় জানায় হাজার হাজার মানুষ।

বর্ধমান

যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে জমির আন্দোলন যখন তীব্র হয়, তখন চৈতন্যপুরের জমিদারের খাসজমি, বেনামি জমি উদ্ধারের আন্দোলনও তীব্র আকার নেয়। প্রায় ৫ হাজার কৃষকের জমায়েত। সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন নিখিল সর-এর সঙ্গে সমর বাওরা। তিনি জমিদারের গুলিতে আহত হন। কোনক্রমে বেঁচে ফেরেন। ১৯৬৫ সালে সি পি আই(এম) দলের সদস্যপদ পান। মঙ্গলকোটের কৃষক আন্দোলন তাঁকে সামনের সারিতে নিয়ে আসে। দীর্ঘ জমির আন্দোলনের পর বামফ্রন্ট সরকার গঠন হলে ১৯৭৮ সালে সি পি আই(এম) জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৮২ সালে। ১৯৮৩ সালে কৃষকসভার জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে মঙ্গলকোটের বিধায়ক নির্বাচিত হন। রাজ্য কৃষকসভার সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৯৯৫ সালে। ২০০৬ সালে নাসিকে সর্বভারতীয় কৃষকসভার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। অসুস্থতার কারণে এই পদগুলি থেকে অব্যাহতি নেন।

সমর বাওরা কাশেমনগর হাইস্কুল এবং তারপর কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে পাশ করে গ্রামে ফিরে এসে সাক্ষরতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন ও ছয়মাস যেতে না যেতে কৃষক আন্দোলনের সামনের সারিতে চলে আসেন। প্রয়াত মেহবুব জাহেদী, নিখিল সরের সংস্পর্শে আসেন। কিছুদিন গ্রামের হাইস্কুলে শিক্ষকতাও করেন।

শ্রী বাওরা শুধু কৃষক নেতাই ছিলেন না, একজন ভাল লেখক এবং সুবক্তাও ছিলেন। রণবাউল ছদ্মনামে অনেক গল্প, প্রবন্ধ লেখেন। শারদীয়া 'নতুন চিঠি'-তে প্রতিবার রণবাউল নামে লিখতেন। তাঁর গল্পে গরিব মানুষের লড়াকু জীবনের কথা উঠে এসেছে। 'নতুন চিঠি'র প্রকাশনায় তাঁর বই বেড়িয়েছে।

তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধায় নতুন চিঠিও ছিল।

গুসকরা

৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ বাবরি মসজিদ ভাঙার দিন

জেলার সর্বত্র ঐক্য ও সংহতির মিছিলে হাঁটলেন ব্যাপক মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ ডিসেম্বর : ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ ভারতের ইতিহাসে কালো দিন। কেন্দ্রে কংগ্রেসের নরসিমা রাও-র সরকার। আজকের যারা কেন্দ্রে ক্ষমতায় সেই বিজেপি দল বাবরি মসজিদ ভাঙছে। তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু নরসিমা রাওকে সেনা নামানোর কথা বলেন। কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার। সারা দেশে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ এবং মানুষ এই রাজ্যে দাঙ্গার আঁচ লাগতে দেয়নি।

বর্তমানে তৃণমূল ও বিজেপি উভয়ই বর্ধমানে 'খাগড়াগড় কাণ্ড'কে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক 'তাস' নিয়ে খেলা করছে। রাজ্যে বামপন্থীরা দুর্বল হওয়ায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে।

২২ বছর আগেও বামপন্থীদের ভূমিকা যা ছিল। আজকেও তারা উগ্র মৌলবাদের বিরুদ্ধে সম্প্রীতির আহ্বান নিয়ে পথে নামছে। তাই আজকের পশ্চিমবাংলার সর্বত্র বামপন্থীরা তাদের দায়িত্ব পালনে পথে নামে। জেলাজুড়ে বামপন্থীরা আজ পথে নামে ঐক্য ও সংহতি মিছিলে।

বর্ধমান শহরে হাজার হাজার মানুষ (বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, কর্মচারী, শিক্ষক সহ) কার্জনগেট থেকে মিছিল শুরু করে। প্লাকার্ড-এ লেখা 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান', 'মানুষে, মানুষে ভাগ করার চক্রান্ত চলবে না'।। মহিলারাও ব্যাপক সংখ্যায় মিছিলে হাঁটেন। মিছিল শেষ হয় রাজবাড়িতে।

দক্ষিণ দামোদরেও এক বিশাল মিছিল সগড়াই থেকে সেহারাবাজার দীর্ঘ সাত কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে। মিছিল-শেষে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমল হালদার বলেন, এ রাজ্যে বিজেপি-কে ঠেকাতে তৃণমূল নয়, একমাত্র বামফ্রন্টই পারে। সভাপতিত্ব করেন উদয় সরকার।

বর্ধমান

সেহারাবাজার

বোরো চাষে জল দেওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ ডিসেম্বর : সভাধিপতি দেবু টুডু ঘোষণা করেন, এবার বোরো চাষে জল দেওয়া যাবে না। দু'দিন না যেতে যেতেই, সেচমন্ত্রী বর্ধমানে এসে ঘোষণা করে গেলেন বোরো চাষে জল দেওয়া হবে। তাও কখন থেকে দেওয়া হবে, কোনো ক্যানেল কতটা পাবে—সে বিষয়ে ঘোষণা নেই। জেলার চাষিরা সরকারের খামখেয়ালিপনায় চরম বিভ্রান্তিতে। বুঝে উঠতে পারছে না, আদৌ ডি ভি সি-র জলে বোরো চাষ হবে কি-না। মন্ত্রী জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের শেষ দিকে বোরো জলের নির্ঘন্ট প্রকাশ করা হবে। তাহলে চাষিরা বীজতলা কখন করবে? চাষ ও পিছিয়ে যাবে— মে, জুনে ধান উঠতে শুরু করবে। তার মানে, কালবৈশাখি অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে ঠেলে দেওয়া হবে চাষিকে।

চাষিদের প্রশ্ন, জলাধারে জল না থাকলে, কীভাবে বোরো চাষে জল দেওয়া সম্ভব? তাহলে কি জল কিনে জল দেওয়া হবে? তাও, মন্ত্রী ৩ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেননি। ধোঁয়াশা রেখে গেলেন অনেক প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন উঠছে, জলাধারে জল থাকা সত্ত্বেও সভাধিপতি জল না দেওয়ার কথা কী ঘোষণা করেন? ঘোষণা করার দায়ে ডিভিশনাল কমিশনারকে শো-কজ করার কথা জানানো হয়। সব মিলিয়ে এক চরম বিভ্রান্তি রেখে গেলেন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

জেলা কৃষক সভার সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল জানান, মন্ত্রীর বোরো চাষ সম্বন্ধে কোন সম্যক ধারণাই নেই। এইভাবে চাষিদেরকে ধোঁয়াশার মধ্যে রেখে কার্যত চাষিদেরকে বিপদে ফেলা হচ্ছে। তিনি জানান এখন তাহলে বোঝা যাচ্ছে, জলাধারে জল থাকা সত্ত্বেও জল দেওয়া যাবে না বলায়, কে সত্য, কে মিথ্যা তা অন্ধকারে। এছাড়া ১১ দিন বোরো চাষ পিছিয়ে গেলে চাষিরা বিপদে পড়বে। প্রসঙ্গত কৃষকসভা জল না দেওয়ার কথা জানার পর আন্দোলনে নামে।

৩ ডিসেম্বর কানাইনাটশাল বাংলোয় বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলির ডি এম এবং সভাধিপতি, সেচ কর্মাধ্যক্ষ, চিফ ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে বৈঠক করে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এবার ২০ শতাংশ বৃষ্টি কম হলেও বোরো চাষে জল দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন। ডিসেম্বরের শেষদিকে নির্ঘন্ট প্রকাশ করা হবে। তার আগে নবান্নে, ডি ভি সি আধিকারিকদের নিয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, আগে জল না দেওয়ার ঘোষণা ঠিক হয়নি। এজন্য অস্থায়ী ডিভিশনাল কমিশনার রিনা ভেঙ্কটরামনকে শো-কজ করা হবে।

সরকারের এই খামখেয়ালিপনায় জেলার বোরো চাষিরা এক চরম দোলাচলে। চাষ কীভাবে হবে—তা সময় বলবে।

দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর : দশম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন ও ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের সঞ্চিত অর্থ বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মঘটে শামিল হলেন ব্যাঙ্ককর্মীরা। কর্মী নিয়োগ, বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস সহ চাকুরিগত কিছু সুযোগ সুবিধার দাবিও রয়েছে তাঁদের। কোনো দাবি মানতে রাজি নয় সরকার। আজ ঐতিহাসিক ধর্মঘটের নজির গড়লেন সারা দেশের সাথে জেলার ব্যাঙ্ককর্মীরা। ব্যাঙ্কের সাফাইকর্মী থেকে চিফ ম্যানেজার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তোলেন প্রতিবাদী শ্লোগান।

বর্ধমান হাসপাতালে মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর প্রতিনিধিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ ডিসেম্বর : হঠাৎই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হানা দিল মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। ওই সময়ে হাসপাতালে কোনো আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন না। মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা হাসাপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বহির্বিভাগ ঘুরে দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের বক্তব্য, পরিকাঠামো অনেক ক্ষেত্রে ভালো থাকলেও পরিষেবা ঠিকমতো পাচ্ছে না রুগিরা। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তথা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষা মঞ্জুশ্রী রায় এই অভিযোগ অস্বীকার করেন।

সবলা মেলা ২০১৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্য স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের উদ্যোগে এবং বর্ধমান জেলা পরিষদের সহায়তায় বর্ধমান টাউন হলে আয়োজিত ৫ দিন ব্যাপী সবলা মেলার উদ্বোধন করেন এই দপ্তরের মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পরিষদীয় সচিব উজ্জ্বল প্রামাণিক। অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন অধিকর্তা রুমেলা দে, অতিরিক্ত জেলা শাসক ঋষিকেশ মুদি, অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রণব বিশ্বাস, জেলা তথ্য দপ্তরের আধিকারিক মুনমুন সিন্‌হা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সভাধিপতি দেবু টুডু। এই মেলায় ৫০টি স্টল রয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলা চলবে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

নতুন চিঠি

৮ ডিসেম্বর, ২০১৪

অপ-সংস্কৃতির ভাষা

বাঙালিদের হাতেই বাংলা ভাষা যে-ভাবে নির্যাতিত হয়ে চলেছে, তা অন্য কোনো ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় না। অমিশ্রিত বাংলায় কথা বলা 'আধুনিক' বাঙালি তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত বলে মনে করেন না। ইংরেজি ও হিন্দি শব্দের মুহুর্মুহু অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তারা বাংলা বাঁচানোর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সদাতৎপর। ফলে বাংলা ভাষা পরিণত হচ্ছে এক লজ্জাকর জগাখিচুরিতে।

অন্যদিকে, বিভিন্ন অশালীন শব্দের প্রয়োগে বাংলা ভাষার বাচনকে এক জঘন্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার প্রতিযোগিতায় রাজনীতির জগতের কিছু মানুষ বিশেষত তৃণমূল-কংগ্রেসের নেতা ও অনুগামীরা একে অপরকে পরাজিত করার প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন কুৎসিত শব্দের প্রয়োগ ও তৎসহ অঙ্গভঙ্গি সকলকে চমৎকৃত করে চলেছে। তাঁর সার্থক অনুগামী সাংসদ তাপস পাল তো কুৎসিত শব্দ প্রয়োগে রেকর্ড সৃষ্টি করে তাঁর নেত্রীকেও হার মানিয়ে বসে আছেন। সম্প্রতি বিজেপি-র একজন নেত্রীও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সদর্প উচ্চারণে 'রামজাদা'-দেরই এদেশে থাকার একমাত্র অধিকারী হিসাবে ঘোষণা করে বাকি 'হারামজাদা'দের দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন। পরে ক্ষমা চাইলেও এই উক্তির ভয়ঙ্কর তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই উক্তির প্রতিবাদে আবার মুখে কালো কাপড় বেঁধে আবির্ভূত হয়েছেন অন্যান্যদের সঙ্গে সেই মহামহিম তাপস পালও!

হতে পারে, এটা তাঁদের সংস্কৃতিরই অঙ্গ, যে সংস্কৃতির আবহে তাঁরা বেড়ে উঠেছেন। আবার হতে পারে, ভাষায়-আচরণে 'সাধারণ' মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে তাঁদের উত্তেজিত করে তোলার একটি উপায় হিসাবেই কৌশলগত কারণে এই অসাধারণ ভাষা প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন। কিংবা ক্ষমতা হারাবার ভয়ে ভাষা প্রয়োগেও দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাঁদের মনে রাখা দরকার যে 'সাধারণ' মানুষ বলতে তাঁরা যাদের বোঝেন, তাদের এতো নীচ মনে করার কোনো কারণ নেই। গ্রাম-শহরের যে-কোনো সাধারণ মানুষের ভাষা-প্রয়োগ এইসব রাজনৈতিক নেতাদের থেকে অনেক উন্নত। বস্তুতপক্ষে, বাংলার মর্যাদাকে তাঁরাই ধরে রেখেছেন। তথাকথিত উচ্চশ্রেণির এইসব প্রতিনিধিরা যাঁরা নিজেদের সংস্কৃতির ধারক-বাহক বলে মনে করেন, তাঁরাই কার্যত বাংলার সংস্কৃতির সেই মর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে দিচ্ছেন, রাজনীতিকে অপসংস্কৃতিতে পরিণত করে চলেছেন।

রানিগঞ্জে যুবদের রক্তদান শিবির

এক ডজন প্রশ্ন

১. বর্ধমান থেকে কাটোয়া ছোটলাইনে (ন্যারোগেজে) প্রথম কবে ট্রেন চলাচল শুরু হয়? কোন কোম্পানি ট্রেন চালিয়েছিল?
২. বর্ধমান কাটোয়া (বলগোনা-কাটোয়া) ছোট লাইনের ট্রেন চলা থেমে গেল কবে?
৩. ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী যোদ্ধা জন ব্রাউনের কবে ফাঁসি হয়? জন্ম কবে হয়েছিল?
৪. বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু কবে কোথায় জন্মান? কবে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল?
৫. প্রখ্যাত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবে কোথায় প্রয়াত হন? কবে জন্ম?
৬. কার চেষ্টায় কবে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটে? কে আইন জারি করেন?
৭. বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ পাল কবে জেলের মধ্যে উন্মাদ হয়ে মারা যান?
৮. দিল্লির কুতুবমিনারের সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা কবে নিষিদ্ধ হয় কবে এবং কেন?
৯. ঋষি অরবিন্দ ঘোষ কবে কোথায় প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
১০. কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম অশ্বঘোষ? তাঁর জন্ম কবে?
১১. কবে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা ধ্বংস হয়?
১২. প্রথম বিধবা বিবাহ কবে কার উদ্যোগে সম্পন্ন হয়? বর ও কনে কে কে ছিলেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

এঙ্গেলস ও মার্কসবাদ

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

—গত সংখ্যার পর

কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো প্রকাশের পর থেকে একদিকে শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের বিকাশ ঘটাবার জন্য নিরন্তর প্রয়াসের কারণে এবং অন্যদিকে সরকারের কোপ ও পুলিশের তাড়নায় মার্কস ও এঙ্গেলস কোনো জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারেননি। ফ্রান্স থেকে বেলজিয়াম, সেখান থেকে আবার জার্মানি। জার্মানি থেকে আবার বিতাড়িত হবার আগে তাঁরা Neue Rheinische Zeitung নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেও মাত্র এক বছর (এপ্রিল, ১৮৪৮-মে,১৮৪৯) তা চালাতে পেরেছিলেন এবং এঙ্গেলস একাই তাতে একশোটির উপর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। জার্মানির পর আবার ফ্রান্স ও সেখান থেকে মার্কস ইংল্যান্ডে যান। সাংগঠনিক কাজে এবং কখনো কখনো পৈতৃক ব্যবসাসূত্রেও এঙ্গেলসকে অনেক সময়ই মার্কসের সঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হতো। তিনিও ইংল্যাণ্ডে চলে এলেন। এখানেই ১৮৫০ সালে তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে ১৮৪৮-৪৯ সালে জার্মানিতে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহের বিশ্লেষণ করে লিখলেন The Peasant War in Germany। এছাড়াও জার্মানির বিপ্লবী পরিস্থিতি ও প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়া নিয়ে আমেরিকার বাম-মনস্ক পত্রিকা New York Daily Tribune-এ এঙ্গেলস Revolution and Counter-Revolution in Germany শীর্ষক যে প্রবন্ধাবলী লিখেছিলেন তার প্রত্যেকটিই পাঠাবার আগে মার্কস দেখে দিতেন।

১৮৬০ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে পিতা, স্ত্রী ও এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরপর মৃত্যুও এঙ্গেলসকে তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। তবে তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতির মধ্যেই ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডে গঠিত হয় International Working Men's Association। মার্কস তার General Council-এর সদস্য নির্বাচিত হন এবং নিয়মাবলী রচনা করেন। মার্কস সমস্তকিছুই পত্রযোগে এঙ্গেলসকে জানান এবং এঙ্গেলসও ফিরে এসে এই আন্তর্জাতিকের কাজে গভীরভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দশ বছরের বেশি এই সংগঠনকে টিকিয়ে রাখা না গেলেও মার্কস ও এঙ্গেলস কিন্তু রইলেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের স্বীকৃত নেতা হিসাবেই।

মার্কসের জীবৎকালে অনেকানেক প্রবন্ধ ছাড়াও এঙ্গেলস বিশেষভাবে উল্লেখনীয় দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটি Anti-Duhring (১৮৭৬-৭৮) এবং দ্বিতীয়টি Dialectics of Nature। ছাপতে দেবার আগে এঙ্গেলস Dialectics of Nature-এর পুরো পান্ডুলপিটিই মার্কসকে পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং মার্কস তার দশম পরিচ্ছেদের অর্থনীতি-বিষয়ক একটি অংশ নিজে লিখে দিয়েছিলেন। ১৮৭৮ থেকে এঙ্গেলস Dialectics of Nature রচনার কাজে হাত দেন। পল লাফার্গ-এর অনুরোধে ১৮৮০ সালে এঙ্গেলস ফরাসি পাঠকদের জন্য Anti-Duhring-এর নির্বাচিত কয়েকটি অংশ সামান্য পরিবর্তন ও সংযোজন সহ Socialism Utopian and Scientific নাম দিয়ে একটি প্রচারপুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন। মার্কস একটি ভূমিকাও লিখে দেন। পরে ইওরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় পুস্তিকাটি অনূদিত হয় এবং মার্কসবাদ প্রচারে এবং ফরাসি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মার্কসের জীবৎকালে যেমন, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরেও নিজের জন্য কোনো স্বতন্ত্র স্বীকৃতি দাবি করেননি এঙ্গেলস। বরং ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যুর পরেও ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত যে বারো বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, তার প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন মার্কসের অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করা, নবতর রচনা, চিঠিপত্র ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে মার্কসবাদকে স্পষ্টতর ও পূর্ণতর করে তোলার নিরন্তর প্রয়াসে। ১৮৮৪ সালে রচিত Origin of the Family, Pricate Property and the State গ্রন্থটিতে এঙ্গেলস মানবসমাজের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস তথা আদিম সাম্যবাদী সমাজ, তার ক্রমিক অবসান ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ভিত্তিশীল শ্রেণি-সমাজের উদ্ভব, রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তার মৌল চরিত্র, এবং শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের অনিবার্য অবলুপ্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পরিবার ও তার বিবর্তনের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ করেন। আর ১৮৮৬ সালে রচিত Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy গ্রন্থে তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার দার্শনিক উৎস নির্ণয় এবং পূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিক মতবাদের ত্রুটি ও তাদের সঙ্গে এই বিশ্ববীক্ষার পার্থক্য নিরূপণ প্রসঙ্গে হেগেল ও ফায়েরবাক-এর দর্শনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

দুটি পুস্তক ও বহু প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি চিঠিপত্র ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এঙ্গেলস বারংবার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে মার্কসবাদ একটি সৃষ্টিশীল মতবাদ, প্রায়োগিক বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো তাত্ত্বিক গোঁড়ামি নয়, তাই পরিবর্তমান সামাজিক বাস্তবতার উপযোগী নতুন নতুন সিদ্ধান্ত তাকে গ্রহণ করতে হবে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিভিন্ন দিকের উপর তিনি

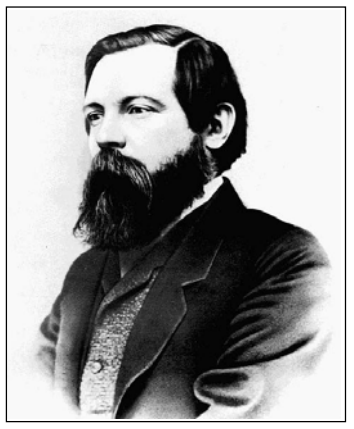

বিশেষ আলোকপাত করেছেন, যার মধ্যে ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যে সম্পর্কের দিকটি বিশেষ উল্লেখের আপেক্ষা রাখে। এই বিষয়ে যাতে কোনো যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তার দ্বান্দ্বিক চরিত্রকে আচ্ছন্ন না করে, সেজন্য তিনি স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন যে চূড়ান্ত বিচারে উৎপাদন-সম্পর্ক, উৎপাদনের পদ্ধতিই উপরিকাঠামো তথা রাষ্ট্র, মতাদর্শ ও সামাজিক চেতনাকে নির্ণয় করে, কিন্তু বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় উপরিকাঠামোগত উপাদানগুলিও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।

মার্কসের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের প্রতি এঙ্গেলসের মন্ময় নিষ্ঠা যেমন ইতিহাসে অতুলনীয়, তেমনি সেই বন্ধুত্বজাত ঐতিহাসিক সৃষ্টির প্রতি আত্মগরিমাহীন তন্ময় নিষ্ঠা তাঁকে এক অতুলনীয় মহত্বে উত্তীর্ণ করেছে। ফ্রান্জ্ মেহ্রিং প্রণীত Lessing-Legende নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' অংশটির উচ্চ প্রশংসা করে ১৮৯৩ সালের ১৪ জুলাই তাঁকে এক চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "এর মধ্যে আপত্তির যদি কিছু থাকে তা হল যতটা কৃতিত্ব আমার পাওনা নয়, ততটা কৃতিত্ব আপনি আমায় দিয়েছেন। আমি যখন যা কিছু নিজে থেকে খুঁজে বের করেছি তার সবকিছুকে ধরে নিয়েই বলছি, মার্কস কিন্তু তার চেয়েও দ্রুত পর্যবেক্ষণ ও গভীরতর দার্শনিক প্রজ্ঞার সাহায্যে সে-সব অনেক আগেই আবিষ্কার করে ফেলেছেন। মার্কসের মতো একজন মানুষের সঙ্গে চল্লিশ বছর ধরে কাজ করবার সৌভাগ্য যার হয়েছে, তার পক্ষে নিজের যতটা স্বীকৃতিই পাওয়া উচিত বলে মনে হোক না কেন, সেই মানুষটির জীবিতাবস্থায় তা পাওয়া সম্ভব নয়। সেই মহত্তর মানুষটির মৃত্যুর পরে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিটিকে সহজেই যতটা নয় ততটা বড় করে দেখানো যায়। আমার ক্ষেত্রেও বোধহয় ঠিক সেই ব্যাপারটাই ঘটেছে। ইতিহাসই শেষ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবে।"

মার্কসবাদ প্রণয়নে এঙ্গেলসের প্রকৃত ভূমিকার যথাযোগ্য মূল্যায়ন তাই পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

দাবি না মানায় ক্ষেতমজুররা ধর্মঘটে অবিচল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ ডিসেম্বর : নানান হুমকি, নানান মিথ্যা মামলা সত্ত্বেও জেলাতে চলছে ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন। বামফ্রন্ট সরকারের সময় সরকার ছিল ক্ষেতমজুরদের পাশে। এখন তাদের আন্দোলনকে ভাঙতে তৃণমূলিরা নানান চক্রান্ত চালাচ্ছে। মাথা হেঁট করতে রাজি নয় মাধবডিহি থানার আড়ুই গ্রামের শতাধিক ক্ষেতমজুররা। পেটে গামছা বেঁধে তারা ১৫০ টাকা দু কেজি চালের দাবিতে ৫ দিন ধরে ধর্মঘট চালাচ্ছেন। এতেই ঘুম কেড়েছে গ্রামের শাসক দলের মাতব্বরদের। এককাট্টা, গরিব মানুষের জোটকে সিঁদুর রাঙা মেঘ দেখছে তৃণমূলিরা। গ্রামের কিছু মালিক, কৃষক ঐক্যের স্বার্থে আলোচনায় বসতে চাইছে। বাদ সাধছে তৃণমূলি মস্তানরা।

তারা এই আন্দোলন ভাঙতে নানান পথ নিচ্ছে। কিন্তু দমবার পাত্র নয় ক্ষেতমজুররা। আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ক্ষেতমজুর মিছিলে পা মেলান কৃষক নেতা তথা এলাকার বিধায়ক বাসুদেব খাঁ, আব্দুল সবুর, রামসদয় বাগদী, দিনবন্ধু মালিক প্রমুখ। লড়াকু ক্ষেতমজুর আন্দোলন পাশের গ্রামেও মনোবল বাড়াচ্ছে ক্ষেতমজুরদের।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

শিক্ষার হালচাল

সুকৃতি ঘোষাল

শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষাব্যবস্থা অভূতপূর্ব সংকটে বেসামাল হয়ে পড়েছে। বিগত সরকারের শিক্ষা পরিচালন নীতি ও তার রূপায়ণের জন্য গৃহীত উদ্যোগ নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। তার সবটা হয়তো অসঙ্গত নয়। কিন্তু সরকারের লক্ষ্য এবং লক্ষ্যপূরণের জন্য দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়নি। সরকার চেয়েছিল, প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক থাকুক, যাতে নিম্নবিত্তের মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। সে ব্যবস্থা শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। মিড-ডে মিলের সুবন্দোবস্ত করে সর্বশিক্ষা অভিযানকে সফল করার কাজে সরকার ছিল আন্তরিক। মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার সুযোগ থাকা দরকার, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। শুধু ছাত্র নয়, তাদের শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের উপস্থিতি আবশ্যক। তাই প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা ছিল পূর্বতন সরকারের।

এইসব উদ্যোগের পাশে যদি চলতি উদ্যোগগুলোকে রাখি আমরা তা হলেই এক পরিকল্পনাহীনতা, এক দিশাহীনতা চোখে পড়ে। সরকারের পূর্বঘোষিত নীতি যদি কিছু থেকে থাকে তা হল, শিক্ষাকে দলতন্ত্রমুক্ত করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটানো। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সরকার ঠিক বিপরীত পথে হাঁটছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে ফেলতে কোর্ট, কাউন্সিল প্রভৃতি নিয়ামক সংস্থায় নির্বাচিত সদস্যের বদলে মনোনীত সদস্য ঢোকাতে আইন বদলানো হয়েছে। উপাচার্য নিয়োগের নিয়ম তিন বছরে তিনবার বদলানো হয়েছে, যাতে সার্চ কমিটিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণে বিন্দুমাত্র ফাঁক না থাকে। শিক্ষক নিয়োগে দলীয় আনুগত্য শুধু নয়, পারিবারিক সম্পর্কের তলায় তলিয়ে গেছে মেধা ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষ। নিয়মনীতিকে তোয়াক্কা না করতে গিয়ে নিয়োগ সংস্থাগুলো এমন বে-কায়দায় পড়েছে যে মামলা-মকদ্দমার চাপে বার্ষিক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারছে না।

বিগত সরকারের একটা শ্লাঘার বিষয় ছিল প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরে সময়ে পরীক্ষা হতো, ফল বের করা যেত নির্দিষ্ট সময়ে। বর্তমানে দুটিই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৪ সালে স্নাতক স্তরের শেষ পরীক্ষা (পার্ট-থ্রি) ভোটের কারণে এগিয়ে আসে। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে স্নাতকের ফল হাতে পায়, এ রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে অন্যত্র ভর্তি হতে পারে, সে সব বিচারে এ উদ্যোগকে সকলে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু মার্চ-এপ্রিলে যে পরীক্ষা হল, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তার ফল প্রকাশিত হল সেপ্টেম্বর মাসে। অসম্পূর্ণভাবে। যার ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে অবর্ণনীয় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল।

কলেজস্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাই এতকাল গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। কোথাও কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি এমন নয়। কিন্তু বর্তমানে মেধার স্থান নিয়েছে পেশিবল, অর্থবল। কেন্দ্রীয়ভাবে অন-লাইনে আবেদন করে ভর্তির একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল গতবছর। সব মহলেই সেই উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চাপে এ বছর শেষ মুহূর্তে সে ব্যবস্থা থেকে সরে আসে উচ্চশিক্ষা বিভাগ। ফলে ভর্তিকে কেন্দ্র করে আর্থিক লেনদেনের বহর এত বেড়ে যায় যে সরকার আগামী বছর থেকে অন-লাইনে ভর্তির নির্দেশ আবার জারি করেছে। তবে তা কেন্দ্রীয়ভাবে নয়, কলেজগতভাবে। তাই স্থানীয়ভাবে চাপ সৃষ্টির সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। অর্থাৎ দলগত আস্ফালনের ফলে গৃহীত অবস্থার দায়ভার না নেবার কৌশল ছকেই নতুন নির্দেশনামা বার করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে অন্যান্য সব আয়োজন ব্যর্থ হয়। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি শিক্ষাঙ্গনে নিগৃহীত হন, অধ্যক্ষের ওপর যদি চড়াও হয় তাঁরই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা, তাহলে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয় সেখানে আর যাই হোক পঠন-পাঠন হওয়া অসম্ভব। অথচ এটাই এখন দস্তুর। স্কুলে-স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার ওপর হামলা করছে বহিরাগতরা, প্রায়শই শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয় নিয়ে। কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এমন কী একই দলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীকে, নিকেশ করতে হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রায়শই আক্রোশ গিয়ে পড়ছে অধ্যক্ষ বা উপাচার্যের ওপর। এই অশান্তি এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে উত্তপ্ত শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক দখলদারিত্বই মুখ্য, বিদ্যাচর্চা নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়েছে। সুপরিকল্পিতভাবে এসব সমস্যার সমাধান না করলে অচিরেই শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ একেবারে পিছনের বেঞ্চে চলে যাবে। সে পশ্চাৎপদতা কি আটকানো যাবে? সরকার চায় কি না, আন্তরিকভাবে চায় কি না, সময়ে বোঝা যাবে।

বর্ধমান শহরের গণ-পরিবহণ ব্যবস্থা কোন পথে?

বিশেষ প্রতিবেদক, বর্ধমান : বর্ধমান শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থা কোন পথে? বড়ো ধরনের একটা সংঘাতের আশঙ্কা কি পলে পলে বাড়ছে? প্রশ্ন তুলছেন নিত্যযাত্রীরা। যারা ভুক্তভোগী। যারা প্রতিদিন সমস্যায় পড়ছেন। বর্ধমান শহরে গণ-পরিবহণ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে সমস্যা বাড়ছিল। সমস্যা সমাধানে বাম-পরিচালিত বর্ধমান পুরসভা শহরের দু-প্রান্তে দুটি অত্যাধুনিক বাসস্ট্যাণ্ড নির্মাণ করেন। তৃণমূলের পরিচালিত পুরবোর্ড এসে দুটিকেই চালু করেন 'উত্তরা' ও 'পূর্বাশা' নাম দিয়ে। কিন্তু পরিকাঠামো সম্পূর্ণ না করায় এবং তুঘলকি সিদ্ধান্তের জেরে জট ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

প্রথমত, পুরনো পরিকল্পনা ছিল শহরের ভিতর দিয়ে ক্রিশ-ক্রশ পদ্ধতিতে রুট-এর বাসগুলি চলবে। সেভাবেই প্রথমদফায় চালু হয় ক্রিশ-ক্রশ পদ্ধতি। কিন্তু অচিরেই সে পদ্ধতি তুলে নিয়ে বাসগুলিকে শহরের প্রান্ত থেকেই ছাড়ার ব্যবস্থা হয়। সম্ভবত, বামেদের তৈরি সমাধানসূত্র মেনে নিলে নয়া-কর্তাদের 'প্রেস্টিজ' থাকে না, তাই এ সিদ্ধান্ত। ফল ভুগছেন সাধারণ মানুষ। প্রশাসনের অনেকেই, পরিবহণ দপ্তরের কর্মীরাও আড়ালে বলছেন পরিকাঠামোর ঘাটতির কথা। কিন্তু সামনে সে কথা বলার হিম্মত কার আছে?

এক, শহরের বাইরে বাস নিয়ে গিয়ে প্রথমে বেশ কিছু মিনিবাস নামানো হয়। এমনকি বাইরে থেকে এনেও। এখন লোকসানের ধাক্কায় সেগুলি কম চলছে। ভুগছেন নিত্যযাত্রীরা।

দুই, খরচ বাড়ছে যাত্রীদের। ধরা যাক, কেউ কাটোয়া থেকে বর্ধমান আসছেন। ভাড়া ৪০ x ২ = ৮০ টাকা। এখন তাকে এর সাথে ব্যাটারি অটোর ভাড়া বাবদ ১৫ x ২ = ৩০ টাকা গুনতে হচ্ছে শহরের ভিতরে আসতে। মিনিবাস-এ খরচ ৮ x ২ = ১৬ টাকা। রিক্সা পেলে আরও কিছু বাড়তি খরচ।

তিন, বাংলাদেশের ঢাকার মতো বর্ধমানকেও 'রিক্সার শহর' বলা যায়। রিক্সা শহরের গণপরিবহণের বহুদিন প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। রিক্সা-চালকদের তরফে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ থাকলেও এর কোনও বিকল্প নেই। এই মুহূর্তে ব্যাটারিচালিত অটোর প্রচলনে শহরে রিক্সাচালকেরা সমস্যায়। জানা গেছে, বিহার-উত্তরপ্রদেশ বা বাইরে থেকে আসা চালকরা অনেকেই রিক্সা মালিককে জমা দিয়ে দিচ্ছেন। অনেক অটো চলছে শহরের জি টি রোড বরাবর। রিক্সাচালকেরা সংখ্যায় কমে গেলে বাকি শহর থমকে যেতে বাধ্য।

চার, পূর্তভবন, রথতলা, কাঞ্চননগর, শালবাগান রুটে টাউন সার্ভিস বা মিনিবাস চলে। দু-দশক ধরে এটি শহরের নির্ভরযোগ্য বিকল্প পরিবহণ মাধ্যম। সংকটের জেরে তারাও আন্দোলনে নামছেন। একেবারে সসেমিরা অবস্থা।

পাঁচ, ব্যাটারি-চালিত ইকো রিক্সা নিয়েও সমস্যার শেষ নেই। প্রথমত, কোনও পরিকল্পনা, কোনও অনুমোদন ছাড়াই প্রতিদিন শহরে ছোট গাড়িগুলো নামছে। এমুহূর্তে ২২৭টি। না পরিবহণ দপ্তর, না প্রশাসন, না স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ পুরসভা—সমন্বয় নেই। লাইসেন্সবিহীন, চালকের গাড়িতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে? আশঙ্কা থাকছেই।

ছয়, ব্যাটারিচালিত অটোর সংখ্যা বাড়ছে কেন? প্রতিদিন জি টি রোড-এ চোখ রাখলেই নয়া নয়া কোম্পানির নতুন নতুন গাড়ি চোখে পড়ছে। প্রথমত, তুলনায় দ্রুত চলে এবং একসাথে ৫/৬ জনকে নিয়ে যায়, এমন মাধ্যম এটি। অনেকের প্রথম প্রথম প্রতিদিন ১০০০ টাকা কি তারও বেশি রোজগার হচ্ছিল। তাই অনেকে এটি কিনেছেন। অনেকে আবার নিজে কিনে চালানোর জন্য চালক রাখছেন। দ্রুত এবং তুলনায় সহজ রোজগার। সংখ্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই।

সাত, কথা ছিল, ব্যাটারিচালিত গাড়ি চলবে শহরের ভিতর নির্দিষ্ট রুটে। কিন্তু কার্যত জি টি রোড -এই যত ভিড়। কোনো রুট নেই। নবাবহাট থেকে আলিশা বা অনেকক্ষেত্রেই স্রেফ বীরহাটা পর্যন্ত লাভজনক রুটে বেশি বেশি চলছে এগুলি। ক্রমশ জট বাড়ছে। রাতের দিকে সমস্যা বাড়ছে।

আট, বর্তমানে অটো বনাম রিক্সা বনাম মিনিবাস দ্বন্দ্ব বাড়ছে। প্রত্যেকেই খদ্দের হারানোর আশঙ্কায় ভুগছেন। এর মধ্যে কয়েকদফায় মারামারি পর্যন্ত হয়ে গেছে। অটো-রিক্সা চালকেরাও নাকি দল বাঁধছেন। তা নিয়ে বিজেপি এবং তৃণমূলের গোষ্ঠী-কোন্দল। কবে এর মধ্যেকার বাঁধন ছিঁড়ে প্রকাশ্যে গুঁতোগুঁতি চলে আসবে, এই ভয় পাচ্ছেন অনেকেই। এর মধ্যেই শহরের এক বিজেপি নেতার বাড়িতে ঘেরাও, তার আগে ইকো রিক্সা চালকদের জমায়েত—অনেক কিছুই ঘটছে। প্রশাসন ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায়।

নয়, এ ঘটনা নিয়ে শহরে বিজেপি এবং তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বাড়ছে। কান পাতলেই নানা কথা শোনা যাচ্ছে।

দশ, অন্যদিকে হঠাৎই অটো চালকদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়েছিলেন এক বিজেপি নেতা। দুই তৃণমূল কাউন্সিলাররাও নাকি পিছনে ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তৃণমূলের জনৈক ডাকাবুকো নেতা ওই বিজেপি নেতার বাড়ি চড়াও হন দলবল নিয়ে। বিজেপির একাংশ প্রথমে তার পাশে দাঁড়ালেও বর্তমানে নাকি তাকে দলীয় শ্রমিক সংগঠন থেকে ছেঁটে ফেলেন জেলা সভাপতি। এর পিছনেও কি গোষ্ঠী-রাজনীতি? প্রশ্ন উঠছে।

কিন্তু শহরের গণ-পরিবহণ নিয়ে যাঁরা ভাবিত তারা কী বলছেন, জেনে নেওয়া যাক।

প্রথমত, প্রশাসন এবং পুর-কর্তৃপক্ষ যুদ্ধজয়ের হাবভাব দেখাচ্ছেন। তাঁদের একটি সূত্র জানাচ্ছেন, 'শহরে এ মুহূর্তে যানজট ইতিহাস। অনেক বিকল্প সামনে। মানুষের কোনো সমস্যা নেই।' এ দাবি যে কত অসার তা বীরহাটার ওপারে বা মেহেদীবাগানের কাছে গেলেই প্রকট হবে। পুরনো বাসস্ট্যাণ্ড থেকে কালীবাজার সমস্যা কম হলেও এ দু-প্রান্তে ভয়ঙ্কর যানজট পাকছে, প্রতিদিন।

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র বি সি রোড সহ সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন কাজে আসেন প্রায় ৫০০০-এর বেশি মানুষ। গোটা শহরে আরও অনেক বেশি। ছোট দোকান বা ব্যবসার কাজে। হাজার হাজার লোক প্রতিদিন নানা কাজে শহরে আসেন। এদের পকেট থেকে প্রতিদিন নিমেষে নিঃশব্দে গলে যাচ্ছে কষ্টার্জিত টাকা।

তৃতীয়ত, শহরের বাজার নির্ভর করে মূলত তার পরিসীমার বৃত্তে থাকা গ্রামগুলোর উপর। বাড়তি খরচের ভয়ে শহরে 'ক্রেতা' কম আসছেন। বাজার মার খাচ্ছে। বর্ধমান মিনিবাস ওয়েলফেয়ার অ্যাশোসিয়েশনের পক্ষে প্রদীপ ব্যানার্জী জানাচ্ছেন, অবিলম্বে সমস্যা নিরসনের জন্য জেলাশাসক, জেলার পরিবহণ আধিকারিক, পুর-চেয়ারম্যান, পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়েছেন তাঁদের সংগঠনের নেতা। তাঁদের বক্তব্য "জি টি রোড বা যেখান দিয়ে মিনিবাস চলে,

সেখানে ব্যাটারিচালিত অটো চালানো যাবে না। বিকল্প রুটে চলুক এগুলি। যে গাড়িগুলি চলছে তাদের অনুমোদন কোথায়? কেউ মারা গেলে কী হবে? দুর্ঘটনা ঘটলে? ৩৫টি ওয়ার্ডে দুটি করে ৭০ টি গাড়ি চলার কথারই কি দাম রইলো?"

বিজেপি নেতা সন্দীপ নন্দী জানাচ্ছেন, "অটো বিকল্প পরিবহণ হতে পারে। কিন্তু সেটি চালানোর আগে সর্বদলীয় বৈঠক হলো না কেন? এই পুর-কর্তৃপক্ষের যোগ্যতাই নেই সুষ্ঠু পরিকাঠামো তৈরির।"

প্রাক্তন পুরপতি আইনুল হক। বর্তমানে শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নের বেশিরভাগ কাজ তাঁর আমলেই হয়েছে, অতি-বড়ো সমালোচকও মানবেন। কিন্তু কী বলছেন তিনি? তিনি বলছেন, "উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের আগে কোন লেভেলে এ সিদ্ধান্ত হলো? অটো লাইসেন্সের কী হবে? পরিকল্পিত রুট কোথায়? এতবড়ো সিদ্ধান্তের আগে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শই বা নেওয়া হলো না কেন? ব্যটারি-চালিত অটোগুলির মালিকানা কার? সব কি আইনসম্মতভাবে হয়েছে?" এর পিছনে 'আর্থিক লেনদেন' রয়েছে বলে তাঁদের সন্দেহ। তাঁর কথায়, "শহরের গণ-পরিবহণের অন্যতম বড়ো ভরসা রিক্সাচালকেরা। তারা গরিব মানুষ। তাদেরকে উন্নীত করে অটোর সাথে যুক্ত করা যেতো না কি? তা না করে অপরিকল্পিত, অবৈজ্ঞানিক ও রুটবিহীনভাবে এলোপাথাড়ি অটো চললে সমস্যার জট ক্রমশ পাকবে।"

সংযোজন : এরমধ্যে ৩ ডিসেম্বর বৈঠক করে পুরবোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৭৫টি ইকো-রিক্সার দায়িত্ব তারা নেবে। বাকিগুলি চলবে কি-না দেখবে প্রশাসন। জানা গেছে, প্রতি ওয়ার্ডে দুটি করে মোট ৭০টি এবং পুরপতির ওয়ার্ডে অতিরিক্ত ৫টি অর্থাৎ মোট ৭৫টি ইকো-রিক্সার অনুমোদন মিলবে। বাকিগুলি কীভাবে চলবে, তার সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসন নেবে। জানা গেছে, এ নিয়ে কাউন্সিলারদের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ চলে। কেউ ধাপে-ধাপে, আবার কেউ সবগুলিকে অনুমোদন দেবার দাবি করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ৭৫টিকে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত হয়।

প্রশ্ন উঠেছে, এর ফলে বাকি অটো রিক্সাগুলির কী হবে? সমস্যা কি কমলো, নাকি রয়েই গেল?

দ্রুতগতির ব্যাটারিচালিত অটোর ভবিষ্যৎ তা হলে কী? তুলনায় দ্রুতগতির যানটির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। আজ যদি শাটল্-অটো চালু হয় তো দেখা যাবে, সেদিকেই মানুষের ঝোঁক বাড়বে। রিক্সাওয়ালারা এ শহরের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। তারা গরিব মানুষ, অটোর সঙ্গেও জড়িয়ে গেছে অনেকের জীবিকা। অন্যদিকে বেশ কিছু রুটে টাউন-সার্ভিস মানুষের ভরসা। সেখানেও কাজ করেন বহু মানুষ। সব মিলিয়ে প্রয়োজন সুষ্ঠু-সুষম পরিকল্পনা, যেটার অভাব ক্রমশ প্রকট হচ্ছে।

যে-কোনো উন্নয়নশীল শহরের মেরুদণ্ড গণ-পরিবহণ। শহরের সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধা দেখা সব দেশেই প্রশাসনের দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, এর উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে মাঝারি শহরের আর্থিক-ব্যবসায়িক 'স্বাস্থ্য'ও। যা বর্তমানে সমস্যায়। গণ-পরিবহণও 'ঘেটে-ঘ'। কর্তৃপক্ষের তুঘলকি সিদ্ধান্তের দাম কি সাধারণ মানুষকে দিতে হবে? কেন?

চিত্তরঞ্জন রেলকারখানা বাঁচাতে ‘সেভ সি এল ডব্লু’ কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চিত্তরঞ্জন, ৩০ নভেম্বর : চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা এই মুহূর্তে সঙ্কটের আবর্তে। প্রথম এন ডি এ সরকারের সময়ে এই কারখানার বিদ্যুৎ ইঞ্জিন উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ১৫০টি থেকে ৬৭টিতে নামিয়ে আনা হয়েছিল। এবারও নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর কারখানার এ বছরের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৮০টি ইঞ্জিন থেকে কমিয়ে ২৫০টি করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, আরও ৩০টি কমতে পারে। সেক্ষেত্রে, লক্ষ্যমাত্রা কমে দাঁড়াবে ২২০টিতে। ইতিমধ্যেই কারখানার বেশিরভাগ যন্ত্রাংশ উৎপাদনের কাজ ‘অফলোডিং’, ‘আউটসোর্সিং’ করে বেসরকারি সংস্থায় পাচার করা হয়েছে। কর্মী সংখ্যা ১৭ হাজার থেকে ১১ হাজারে কমিয়ে আনা হয়েছে। এই অবস্থায় কারখানার সব ক’টি ট্রেড ইউনিয়ন এবং অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি এক সভায় মিলিত হয়ে কারখানার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ওই সভাতেই ‘সেভ ইস্কো’ কমিটির ধাঁচে ‘সেভ সি এল ডব্লু’ কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সি এল ডব্লু লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং সি আই টি ইউ নেতা অলোক ঘোষ। কমিটির বক্তব্য, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ছয় দশকের প্রাচীন এই কারখানাকে রক্ষা করাই আশু কর্তব্য। উল্লেখ্য, এই কারখানার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে ডানকুনিতে ইঞ্জিন কারখানা গড়ে তুলেছে রেল। যেখানে পিপিপি মডেলে বেসরকারি ক্ষেত্রে ইঞ্জিন তৈরির লক্ষ্যে এগোচ্ছে রেল দপ্তর। অন্যদিকে, রেলবোর্ড ভেঙে দেওয়ার অশনি সংকেত শুনিয়েছে মোদী সরকার। সেক্ষেত্রে প্রথম আঘাত আসবে রেলের ছটি উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে বৃহত্তম সংস্থা চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানার ওপর। এন ডি এ সরকারের সময়ে রাকেশ মোহন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই কারখানাকে কর্পোরেশন গঠনের মাধ্যমে বেসরকারিকরণের চেষ্টা হয়েছিল। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনে সরকার সেবার পিছু হঠেছিল। কমিটির আশা এবারও যৌথ আন্দোলনে পিছু হটবে সরকার।

সমবায় নির্বাচনে বামপন্থীদের বিপুল জয়

২৬ নভেম্বর চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার সমবায় সমিতির নির্বাচনে বামপন্থীরা বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে। ভোট লুটের চেষ্টাকে পরাহত করে সি আই টি ইউ সমর্থিত প্রার্থীরা ৪০টির মধ্যে ২৯টি আসনে জয়লাভ করে। ৬০ বছর আগে ৪০ জন বামপন্থী কর্মী এই সমবায় গড়ে তোলেন। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা এগারো হাজার। আমানত কয়েক কোটি টাকা। পাঁচ বছর আগের নির্বাচনেও বামপন্থীদের হাতেই সমবায় পরিচালনার ভার তুলে দিয়েছিলেন রেলকর্মীরা। শাসকদলের ‘এলোমেলো করে দে-মা, লুটেপুটে খাঁই’—এই অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য রেলকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

বর্ধমান স্টেশনের নিরাপত্তা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ ডিসেম্বর : খাগড়াগড় কাণ্ডের পর এবার নড়েচড়ে বসলো রেল প্রশাসন। বর্ধমানের জঙ্গি ডেরার জঙ্গিরা বর্ধমান স্টেশনকে করিডর হিসাবে ব্যবহার করতো। আর সেই কারণেই বর্ধমান স্টেশনের যাত্রীসুরক্ষাও স্টেশনের নিরাপত্তা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিল রেলপ্রশাসন।

বর্ধমান স্টেশন রাজ্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জংশন স্টেশন। একদিকে মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম সহ উত্তরবঙ্গ, অন্যদিকে হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বর্ধমানের যে জঙ্গি ডেরাগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে, সবগুলিই বর্ধমান স্টেশনের এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেই। একদিকে খাগড়াগড়, বাবুরবাগ, বাদশাহী রোডের মাঠপাড়া অন্যদিকে বাজেপ্রতাপপুরের হটুদেওয়ান—সবকটি জঙ্গি ডেরাই বর্ধমান স্টেশনের এক কিলোমিটারের মধ্যে। বর্ধমান স্টেশনের ম্যানেজার স্বপন অধিকারী জানান, প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ এক নং থেকে একেবারে ৮ নং প্ল্যাটফর্মের সর্বত্র সিসি টিভি বসানো হবে। এছাড়া স্টেশনের ঢোকা এবং বের হওয়ার পথে বা গেটে বসানো হবে স্ক্যানার মেশিন। এখানে উল্লেখ্য, বছর পাঁচেক আগে বর্ধমান স্টেশনের ঢোকা বের হওয়ার গেটে মেটাল ডিটেক্টর ছিল। কিন্তু বছর দুয়েক হল সেই সব আর নেই। প্রতিটি গেটে পুনরায় বসানো হবে মেটাল ডিটেক্টর, লাগেজ স্ক্যানার। তবে খাগড়াগড় কাণ্ডের পর বর্ধমান স্টেশনের নিরাপত্তার জন্য প্রায় প্রতিদিন একেবারে নিয়ম করে স্লিফার ডগ দিয়ে চেকিং করা হবে।

কালনা প্রেস ক্লাবের নতুন কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ ডিসেম্বর : কালনা প্রেস ক্লাবের নতুন কমিটি গঠিত হলো। এদিন সপ্তম দ্বিবার্ষিকী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় লায়ন্স ক্লাব সভাকক্ষে। এই সভা থেকে ১৫ জনের এই কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন সৌমেন পাল, সাধারণ সম্পাদক আলেক সেখ এবং কোষাধ্যক্ষ অশোক মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, সুশীল মিত্র, শম্ভু আগরওয়াল প্রমুখ।

প্রতিবন্ধী দিবসে দুটি কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ ডিসেম্বর : প্রতিবন্ধীরাও সমাজের অঙ্গ। কিছু করে দেখাতে পারে। পারে সমাজকে কিছু দিতে। আজ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে বর্ধমানে জেলা জুড়ে আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠান। বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান দিনটি পালন করে।

রোটারি ক্লাব বর্ধমান সাউথ আয়োজন করেছিল শিশুদের ‘বসে আঁকো’ প্রতিযোগিতা। শেষে ছিল বনভোজন।

বর্ধমান প্রতিবন্ধী সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা এক অভিনব কর্মসূচি নেন। তাঁরা বর্ধমান কাছারি চত্বরে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও জেলা পরিষদের সামনের চত্বর পরিষ্কার করেন।

নবান্নর পায়েস খেয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ ডিসেম্বর : নবান্নের রান্নার মূলপদ হলো পায়েস। সেই পায়েস খেয়েই মারা গেলেন লক্ষ্মী বাগ (৬৮) এবং ললিতা দেবনাথ (৩৫)। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের চাঁদপুর গ্রামে। আরও কয়েকজন অসুস্থ।

গ্রামে মেডিক্যাল ক্যাম্প বসানো হয়েছে। পায়েসে কী ধরনের বিষক্রিয়া হয়েছে তা পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

By Courtsy

S. K. Banerjee

Burdwan

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি রাজীব সেখ, পিতা - আতিয়ার সেখ, গ্রাম - বেতালবন, পোঃ - দ্বারনড়ী, গলসি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম আব্দুর রহিম সেখ, যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত রহিম সেখ নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার পুত্র আব্দুর রহিম সেখ নামে সর্বত্র পরিচিত হল। আব্দুর রহিম সেখ ও রহিম সেখ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি শিবানী সরকার, স্বামী - সঞ্জীব সরকার। ছোটোনীলপুর, আমবাগান, পোঃ - শ্রীপল্লী, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম, SUDARSHANA SARKAR যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত SUUTTARA SARKAR নথিভুক্ত হয়েছে। SUDARSHANA SARKAR, পিতা - SANJIB SARKAR এবং SUUTTARA SARKAR পিতা -SANJIB SARKAR এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সেখ জামশেদ আলি, পিতা - প্রয়াত ওমর আলি। সন্তোষপুর, বড়শুল, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৮ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম সেখ জামশেদ আলি যা আমার বিভিন্ন নথিপত্রে সেখ জামশেদ আলি নথিভুক্ত আছে। আমার পুত্র সেখ রাজিবুল-এর জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত পিতার নাম সেখ জামশেদ নথিভুক্ত হয়েছে। সেখ জামশেদ আলি এবং শেখ জামশেদ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি কাননবালা মণ্ডল, স্বামী - নরেশ মণ্ডল, রামপুর, পোঃ - কাঞ্চননগর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম কাননবালা মণ্ডল। যা রেশনকার্ডে ভুলবশত কানন মণ্ডল নথিভুক্ত হয়েছে। কাননবালা মণ্ডল এবং কানন মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সুরেশ যাদব, পিতা প্রয়াত বিষ্ণু যাদব, লক্ষ্মীপুর মাঠ, কলেজমোড়, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৮ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম পঙ্কজ যাদব। জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত রাজেশ যাদব নথিভুক্ত হয়েছে। সুরেশ যাদব এবং পঙ্কজ যাদব এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মহম্মদ আশিক সেখ, পিতা - মহম্মদ ইয়াসিন সেখ, গ্রাম - বড় মশাগড়িয়া, পোঃ - রসুলপুর, থানা - মেমারি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৬ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম মহম্মদ আসওয়াদ সেখ। যা তার জন্মশাংসাপত্রে ভুলবশত মহম্মদ আসওয়াদ নথিভুক্ত হয়েছে। মহম্মদ আসওয়াদ সেখ এবং মহম্মদ আসওয়াদ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি নন্দ সোরেন, পিতা প্রয়াত বিতুন সোরেন, আলমগঞ্জ কোয়ার্টার, পোঃ - নতুনগঞ্জ, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৪ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম বিদেশ সোরেন যা তার বিভিন্ন নথিপত্রে নথিভুক্ত আছে। রেশনকার্ডে আমার পুত্রের নাম ভুলবশত সোম সোরেন নথিভুক্ত হয়েছে। বিদেশ সোরেন এবং সোম সোরেন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● I, Ramani Kanta Barui, S/o - Lt. Ruidas Barui, recedent of Narayandighi (Rayan Road), P.S. & Dist. - Burdwan by an affidavit before the Executive Magistrate Burdwan on 5th Dec' 14 hereby declare that I have heard from my parents that I was born on 3/12/1948. I have no other documents to proof my date of birth. So, In this affidavit I swear that my date of birth is 3/12/1948.

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর, লন্ডনের ম্যাকলিওড রাসেল অ্যান্ড কোম্পানি; ২। ২০১৪ সালের ৩০ নভেম্বর; ৩। ১৮৫৯ সালের ২ ডিসেম্বর, জন্ম ৯-৫-১৮০০; ৪। ১৮৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর, মেদিনীপুর জেলার মোহবনী গ্রামে, ফাঁসি ১১-৮-১৯০৮; ৫। ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর, ক্যাম্বেল হাসপাতালে, জন্ম ১৯-৫-১৯০৮; ৬। রাজা রামমোহন রায়, ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং; ৭। ১৯২৪ সালের ৪ ডিসেম্বর; ৮। ১৯৮১ সালের ৪ ডিসেম্বর, সিঁড়িতে ৪৫ জনের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটেছিল; ৯। ১৯৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর, জন্ম ১৫-০৮-১৮৭২; ১০। সাহিত্যিক বিমল রায়চৌধুরী, ১৯৩০ সালের ৬ ডিসেম্বর; ১১। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর; ১২। ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর, বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও কনে কালীমতি।

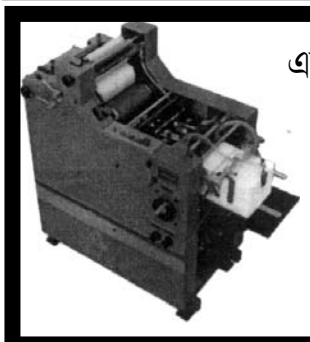

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫, ৩০০০১১৩

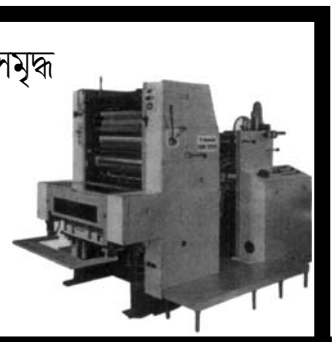

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা